১৭

প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০০৫

মানবাধিকার ও সুশাসন
স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

মানবাধিকার কথাটা সংবিধানে আমরা দু'জায়গায় ব্যবহার করেছি। প্রস্তাবনায় আমরা বলেছি, 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা; যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।'

১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

মনুষ্যকুলে জন্মলাভের কারণে মানুষ মানবাধিকারপ্রাপ্ত হয়। আমরা সংবিধানে মানবাধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে অভিহিত করেছি। যে অধিকার না থাকলে মানবজীবন পূর্ণ হয় না, তা-ই মৌলিক অধিকার।

আমরা 'সুশাসন' শব্দটি সংবিধানে ব্যবহার করিনি। তবে সুশাসনের ইংরেজি 'গুড গভর্ন্যান্সের' 'গভর্ন্যান্স' শব্দটি সংবিধানের ইংরেজি পাঠের ৮ অনুচ্ছেদের (২) দফায় রয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেখানে ৮ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বলা হয়েছে: 'এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।'

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত মূলনীতিগুলো যেকোনো দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং কল্যাণকর। ওই নীতিগুলো আইনের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয় বলে কট্টর আইনবিদরা এদের তেমন মূল্য বা গুরুত্ব দেন না। সদিচ্ছায় এই রাষ্ট্রনীতিগুলো অনুসরণ করলে তা দেশের জন্য মঙ্গলই বয়ে নিয়ে আসবে।

মানবাধিকারের তত্ত্ব দ্রুত প্রসার লাভ করছে। বর্তমানে মানবাধিকারের নানা প্রশ্ন বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ হলেও মোটামুটি একটা মতৈক্য গড়ে উঠেছে এবং মূল বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে। মানবাধিকারের উৎস হিসেবে গ্রিক ও ইহুদি-খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের কথা বলা হয়।

মানব-ইতিহাসে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে আদান-প্রদান চলছে। দেনা-পাওনা নিয়ে কাউকে ছোট বা বড় হিসেবে গণ্য করার তেমন প্রয়োজন নেই। বর্তমান ভারতীয়রা বা আরবরা সংখ্যাতত্ত্ব বা বীজগণিতের জন্য কোনো বৌদ্ধিক সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে না। এসব জ্ঞান এখন মানব উত্তরাধিকারের অংশ। সকল মানুষ তার শরিক। হেবিয়াসকর্পাস বা বন্দিসন্দর্শনের প্রতিকার আজ সর্বত্র সমাদৃত। জন্মসূত্রে কোনো দেশে এর বিকাশ ঘটে তা কেবল ঐতিহাসিক আইনি গবেষণার ব্যাপার। বিড়াল কাঠের কি না, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি তা ইঁদুর ধরতে পারে। একসময় ছিল হেবিয়াসকর্পাসের মামলায় আইনজীবীরা কোনো ফি নিতেন না এবং এ ধরনের মামলার সর্বাগ্রে দ্রুত শুনানি হতো। তখন কালেভদ্রে এমন মামলা হতো। এখন বন্দিসন্দর্শনের মামলার সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বলা বাহুল্য, ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকারের সনদ বহুলাংশে পশ্চিমা নাগরিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। আমাদের চিন্তাধারায় ওই সনদের বক্তব্যকে সাঙ্গীকরণ করা সহজ নয়। আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের ঐতিহ্যে ওইসব অধিকারের সূত্র বা মূল অন্বেষণ বা আবিষ্কার করতে পারলে আমাদের কাছে ওইসব আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, ওই ১৯৪৮ সালের সনদের বেশ পূর্বেই আমাদের মানবাধিকার সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আমার কিছু ধারণা ছিল। স্বাধীনতার দাবি ও আন্দোলনে মানবাধিকারের কথা এসেছিল। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে আমরা ভাগ্যহত অসহায় মানুষ, নিপীড়িত ও অবহেলিত নারী এবং বঞ্চিত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষক-শ্রমিকদের অধিকারের কথা শুনে এসেছি। নজরুল বলেন, তিনি সেই দিন হবেন শান্ত যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে তার অর্ধেক করেছে নারী। লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে লালন প্রশ্ন করেছেন স্বর্গে পুণ্যবান পুরুষ হুর পেলে পুণ্যবান রমণী কী পাবেন! তিনি সকল মানুষের সমতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, গোরুর নানা রঙ কিন্তু দুধের রঙ সর্বত্র সাদা।

উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটলে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা হয়। গুয়ানতানামো বে ও বাগদাদের বন্দিশালায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদ উঠলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বভাব সংশোধন করার এবং ঘটনা তদন্ত করার প্রয়াস পায়। আমরা সাফ দেলের মহড়ায় বিব্রতকর অবস্থায় হেফাজতে হার্টফেলের মোকাবিলা করেছি দায়মুক্তির আইন পাস করে। কেউ জানল না কেমন করে হতভাগ্য লোকদের মৃত্যু হলো।

বাংলাদেশে ৪৫টিরও বেশি জনজাতিগত ও ধর্মগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছেন, যাঁরা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা দু'জন। সংবিধানে তাঁদের অধিকার রক্ষার্থে বিশেষ কোনো বিধান নেই। তবে ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষবিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অ্যাকিলিসের দুর্বলতা যেমন তাঁর পায়ের গোড়ালিতে তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক গণতন্ত্রে একটা দুর্বলতা রয়েছে। সংখ্যালঘুরা দুর্বল থাকে এবং তাদের বঞ্চনা ও প্রান্তিকীকরণ প্রতিহত করা একটা সমস্যাসঙ্কুল ব্যাপার। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যজনিত ব্যবহার এবং আনুভৌমিক অসাম্য সংখ্যাগরিষ্ঠভিত্তিক গণতন্ত্রে প্রায়শ দেখা যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সামাজিক হামলা অনেক সময় প্রতিরোধ করা যায় না। আইনের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা অনেক সময় আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ ও বিচার বিভাগের কর্তব্যকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউএনডিপির) ২০০০ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'মানবাধিকারের যেকোনো আলোচনায় রাষ্ট্র সর্ববিরাজমান হয়– হয় আসামি নয় রক্ষাকর্তা হিসেবে বিচারক, জুরি বা বিবাদি হিসেবে। নিজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য রাষ্ট্রকে প্রায়শ প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন, যখন এর পুলিশ বিচারবহির্ভূত হত্যা বা নিপীড়ন-নির্যাতন করবে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার মানবাধিকারের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় তখনই, যখন তা আইনের শাসনের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। ক্ষমতার স্বৈরাচারী ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব উলে-খযোগ্য প্রতিষ্ঠান তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি আইন পরিষদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং এমন একটি নির্বাহী বিভাগ, যা আইন ও রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি যুক্তিগতভাবে পেশাগত স্বাধীনতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনের এই মুখ্য উপাদানগুলো ক্ষমতার পৃথককরণে নিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের উপস্থিতি রাষ্ট্রের জবাবদিহিতাকে অধিকতর সুদৃঢ় করে।

পাকিস্তান আমলে আমরা বিনাবিচারে আটকের বিরোধিতা করি। বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আটকের আইনে আমাদের শীর্ষস্থানীয় বহু নেতা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রবর্তনের কালে আমাদের সংবিধানে কোনো নিবর্তনমূলক আটকের আইন ছিল না। সংবিধান সংশোধন করে নতুন বিধান সংযোজন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতার আইন পাস করা হয়। সেই আইন বাতিল করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, সংসদ নির্বাচনের সময় তা রক্ষা করা হয়নি। এখন কথিত সন্ত্রাসীদের বিনা বিচারে খতম করা হচ্ছে। দুই বছর আগে হার্ট ফেইলিয়োরে লোক মারা যায় এমন প্রশ্নবিদ্ধ ও সন্দেহজনক পরিপ্রেক্ষিতে, যে আমাদেরকে দায়মুক্তির আইন পাস করতে হয়। এখন আমাদের আশ্বাস দেয়া হচ্ছে 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ব্যাপারে তেমন কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

আমরা শুনছি, এখন পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী 'ক্রসফায়ারে' প্রতিটি মৃত্যুর জন্য নাকি কৈফিয়ত চাওয়া হবে। এ ধরনের কৈফিয়তের প্রতিবেদন 'ক্রসফায়ারে' প্রথম মৃত্যুর পর শুরুতে চাওয়া হলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবত দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা এমনি যে, শিক্ষিত ও আপাতদৃষ্টিতে সচেতন ব্যক্তিগণ 'ক্রসফায়ারে' কথিত সন্ত্রাসীদের মৃত্যুকে স্বাগত জানিয়ে সমর্থন জানাচ্ছেন।

স্বীয় প্রশাসনের ভাবমূর্তি ও সুনাম রক্ষার জন্য ঔপনিবেশিক বিদেশি শাসকরা যে পুলিশ রেগুলেশনগুলো প্রণয়ন করেছিলেন, আমরা আমাদের নাগরিকের জীবনধারণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে তৎপর নই। কত কঠোরভাবে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে আচরণ করা হয়, তার ওপর একটা দেশের সুনাম নির্ভর করে না। বরং আসামির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হয় এবং দুর্বৃত্তরা ও পথভ্রষ্টরা হেফাজতে বা বিচারের পর কারাগারে কেমন ব্যবহার পান, তার ওপর নির্ভর করে একটা দেশের সুনাম। এই কথাগুলো একটি লেখায় আমি ক'দিন আগে বলেছি। তাদের পুনরুক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও মহা হিসাব নিরীক্ষকের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংবিধানে বেশ কিছু নির্দেশনা রয়েছে। আমরা সংবিধান পালনের তাগিদে এই সব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বে ও নিমরাজি, দাতাগোষ্ঠীর চাপে কিছু লোক-দেখানো পদক্ষেপ নিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান চালু করি, কিন্তু তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করি না।

দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা ধীরে, অতি ধীরে এক কুটিল ঘোরালো পথে মানবাধিকারের গণতন্ত্রের বিকাশ দেখছি। দুর্ভাগ্যক্রমে এ অঞ্চলে মৌলিক অধিকার প্রায়শ স্থগিত থাকে। এ বিষয়ের বিরোধ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সুপ্রিম কোর্টের রায় যথাযথভাবে সাংবিধানিক কর্তব্য হিসেবে পালন করা হয় না। বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে– পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগ, স্থানীয় সরকার এবং বিচার বিভাগের পৃথককরণ সম্পর্কে বাংলাদেশের শেষ বিচারালয় যেসব রায় দিয়েছেন, সেগুলো এখনো কার্যকর করা হয়নি।

আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু উপদ্রুত দেশের তুলনায় আমরা ভালো আছি। আইনের সুসংগঠিত কাঠামো, বিদগ্ধ তদন্ত ও বিচার পরিচালনার ব্যবস্থা এবং সাধারণ নাগিরকদের অধিকতর সচেতনতা সত্ত্বেও ইউরোপ ও উত্তর অতলান্তিক অঞ্চলের দেশগুলোতে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেছে। হঠাৎ করে সব লঙ্ঘন-বিচ্যুতি শেষ হয়ে যাবে না। নিবর্তন ও প্রতিকার, উভয় ক্ষেত্রে আমাদের নিরন্তর সজাগ থাকতে হবে এবং বিধান দিতে ও ব্যবস্থা নিতে হবে, নইলে এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের মানবিক ব্যাধির প্রকোপহ্রাস পাবে না।

বেসরকারি সংস্থা *মানুষের জন্য* প্রায় ৬১টি বেসরকারি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান করে আসছে এবং তাদের কাজকর্মের দেখাশোনা করছে। আমি আশা করি, প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের জন্য একটা নিরপেক্ষ অবস্থান রক্ষা করবে এবং এক মধ্যবর্তিতার ভূমিকায় দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের সহায়ক হিসেবে অধিকতর দক্ষতা প্রকাশ করবে।

(১৮ জানুয়ারি ২০০৫ 'মানুষের জন্য' কর্তৃক আয়োজিত 'মানবাধিকার ও সুশাসন: স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ।)

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান: সাবেক প্রধান বিচারপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা

১৮

প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

'ক্রসফায়ারে'র নামে হত্যাকাণ্ড সরকারের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছেঃ আইরিন খান

সাক্ষাৎকার নিয়েছেনঃ এ কে এম জাকারিয়া

প্রথম আলো : ২০০১ সাল থেকে আপনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এখন ২০05 সাল, মাঝে প্রায় চার বছর সময় কেটে গেছে। এ সময়টায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন, উন্নতির দিকে, না অবনতির দিকে?

আইরিন খান : সাধারণভাবে যদি বলতে হয়, তবে অবশ্যই অবনতির দিকে। তবে কোনো দেশের ব্যাপারে পরিসংখ্যান দিয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি-অবনতি পরিমাপ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার যেটা পর্যবেক্ষণ, সেটা বলছি। ২০০১ সালে আমি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, সে বছরটা ছিল বাংলাদেশে নির্বাচনের বছর এবং নির্বাচনের পরপর সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তার পর থেকে প্রতি বছরই বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যায়ক্রমে ঘটেই চলেছে।

বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর দমন-নিপীড়ন ও গ্রেফতারের ঘটনা দেখা গেল। এরপর আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার শুরু হলো। অর্থাৎ একের পর এক এ ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। শুধু নির্বাচনের পরই নয়, এর আগেও আমি অ্যামনেস্টিতে যোগ দেয়ার আগে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর অনেক রিপোর্ট অ্যামেনেস্টি বের করেছে। অর্থাৎ আমি যা বলতে চাইছি, তা হলো– আমরা যদি একটি দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সরকারগুলোর কর্মকাণ্ড বিবেচনা করি, তবে দেখা যাবে যে একের পর এক সরকারগুলো মানবাধিকারের বিষয়টিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অব্যাহতভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছে। আর যত সময় যাচ্ছে সুশাসন ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সেটা দিনে দিনে আরো বাড়ছে।

প্রথম আলো: আপনি সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিরোধী নেতাকর্মীদের ওপর দমন-নিপীড়ন ও আহমদিয়াদের ওপর হামলার প্রসঙ্গ *উল্লেখ* করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ বাহিনী র‍্যাবের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, অনেকে তাদের হাতে ক্রসফায়ারের মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে *উল্লেখ* করছেন। অন্যদিকে ক্রসফায়ারে মূলত সন্ত্রাসীরা মারা যাওয়ায় জনগণ এই কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করছে, আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

আইরিন খানঃ আমি দেশে এসে শুনেছি বা যতটুকু খোঁজখবর পেয়েছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে র‍্যাবের তৎপরতাকে মানুষ সমর্থন করে যাচ্ছে। তারা যেটা বলতে চাইছেন, তা হলো র‍্যাব সন্ত্রাসীদের দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এ ব্যাপারে জনগণকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সাময়িক শান্তির কারণে তারা এটা করছে। কিন্তু র‍্যাব ক্রসফায়ারের নামে যা করছে তাকে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ডই বলতে হবে। কারণ যাদের ধরা হচ্ছে এবং যে সন্ত্রাসীরা মারা পড়ছে, তাদের তো কোনো বিচার হচ্ছে না। তাদের গুলি করে মারা হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে যে একই ধরনের কাহিনী তুলে ধরা হচ্ছে তা সন্দেহজনক। সাধারণ পরিস্থিতিতে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটলেও সরকার এর তদন্ত করবে, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সরকার এ ক্ষেত্রে কিছুই করছে না। বরং এভাবে যে একের পর এক হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটে চলেছে, তাকে সরকার সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এভাবে ধরে ধরে সন্ত্রাসীদের মেরে ফেলা সরকারের নীতিরই অংশ।

কোনো সমাজে যখন বিচার ছাড়াই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং জনগণ তাতে খুশি হয় তখন বুঝতে হবে সেই সমাজে অপরাধকর্ম সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং সরকারের সেই অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতা নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এরই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এটা বলতেই হচ্ছে যে আইন অনুযায়ী দেশ চালাতে ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার এখন র‍্যাব নামিয়েছে।

দূরদৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করলে এটা কখনোই অপরাধ দমনের কার্যকর ও বাস্তবসম্মত কোনো উপায় হতে পারে না। অপরাধীদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে নিরপরাধ ব্যক্তির অধিকারও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সরকার এভাবে লোকজন হত্যা করতে পারে না এবং কোনো বাহিনীকে এভাবে হত্যার লাইসেন্স দিতে পারে না। এটা করা হলে পুরো ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া তথা সমগ্র বিচারব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। ক্রসফায়ারের নামে র‍্যাবের হত্যাকাণ্ড পুলিশ ও বিচার বিভাগের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছে।

সাধারণ জনগণের পক্ষে এত দূরদৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাদের চিন্তা হচ্ছে আজ আমি সন্ত্রাসীর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি কিনা; কিন্তু সরকার তো এভাবে চিন্তা করতে পারে না। আর যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা হলো আজ যাদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে, যাদের হত্যা করা হচ্ছে তাদের পেছনে কাজ করেছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। ফলে এখন সন্ত্রাসীদের যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে তাতে প্রকৃত অর্থে কোনো ফল পাওয়া যাবে এমন গ্যারান্টি নেই। এর আগেও অপারেশন ক্লিনহার্ট নামে একটি অভিযান চালিয়েছিল সরকার, তখন সেনাবাহিনী নামানো হয়েছিল এবং অপরাধী ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে কিছু লোককে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা অ্যামনেস্টির পক্ষ থেকে তখনো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম। এভাবে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে পৃথিবীর কোনো দেশই অপরাধ দমন করতে পারেনি। একটি দেশে সন্ত্রাস ও অপরাধ বিনা কারণে এমন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়

না। তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের হত্যা করা কোনো কাজের কথা হতে পারে না।

প্রথম আলো: বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী বলেছেন, ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসীদের মৃত্যু মানবাধিকারের লঙ্ঘন নয়। আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

আইরিন খান: আইনমন্ত্রী বা সরকার যদি এ ধরনের যেকোনো মৃত্যুর পর নিরপেক্ষ তদন্ত করার ব্যবস্থা করত এবং এরপর যদি প্রমাণিত হতো যে অপরাধী বা সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর বিষয়টি যথাযথই 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যু তখন আইনমন্ত্রী এ ধরনের দাবি করতে পারেন। কিন্তু যেখানে এ পর্যন্ত এতগুলো লোক 'ক্রসফায়ারে' মারা গেল, কিন্তু কোনো তদন্ত হলো না, কোনো বিচারের উদ্যোগ নেয়া হলো না– সেখানে আইনমন্ত্রী কীভাবে বলেন যে এই মৃত্যুগুলো ক্রসফায়ারে ঘটেছে? তদন্ত ছাড়া তো তিনি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কীভাবে জানবেন, মৃত্যুগুলো কীভাবে ঘটছে। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই মৃত্যুগুলোকে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড হিসেবেই ধরে নিতে হবে। বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড কাকে বলে, আন্তর্জাতিক আইনেও কিন্তু এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আছে।

প্রথম আলো: সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সবার নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে, এ অবস্থায় সরকার আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে কীভাবে? অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিষয়টিকে কীভাবে দেখছে?

আইরিন খান: আমরা এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছি, সরকারের সঙ্গেও আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। দু'বছর আগে যখন আহমদিয়াদের ওপর হুমকি ও চাপ শুরু হয় তখন সরকারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছিল যে, যা ঘটছে তাতে সরকারের কোনো সায় বা সমর্থন নেই এবং এটা সরকারের কোনো নীতির অংশ নয়। আহমদিয়ারা বাংলাদেশের নাগরিক, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি সরকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু আমরা দেখলাম সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব রয়েছে, এমন লোকজনই আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে তৎপর রয়েছে। এরপর দেখা গেল সরকার নিজেই আহমদিয়াদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছে। দেখা যাচ্ছে অসহিষ্ণুতার বিষয়টি দিনে দিনে জোরদার হচ্ছে। এর আগে আমরা দেখেছি, হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছে; এখন আহমদিয়াদের ওপর হচ্ছে। সরকার যদি এ ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর আক্রমণ বন্ধের উদ্যোগ না নেয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এ প্রশ্ন এখন খুব স্বাভাবিক যে এর পরের টার্গেট কে? আমরা বাংলাদেশে এখন যে সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করছি, তা হচ্ছে– একদিকে পর্যায়ক্রমে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখার জায়গাটুকু ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর বাইরে অন্য ধর্মের মানুষ, অন্য জাতির মানুষ ও অন্য রাজনৈতিক বিশ্বাসের মানুষের জন্য বাংলাদেশে আর জায়গা থাকছে না। এটা যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য খুবই বিপজ্জনক লক্ষণ। গণতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু মিলেমিশে একসঙ্গে থাকবে।

প্রথম আলো: বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর দমন-নিপীড়ন ও রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবিলায় গণগ্রেফতার– এ প্রসঙ্গগুলো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সরকারের কাছে তুলেছে কী?

আইরিন খান: এ ব্যাপারেও অ্যামনেস্টির রিপোর্ট বের হয়েছে এবং আমরাও সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। কয়েক বছর ধরেই এ রকম হচ্ছে। বিরোধী দলের বড় বড় নেতাদের যেমন গ্রেফতার করা হচ্ছে, তেমনি রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবিলায় নির্বিচারে গণগ্রেফতার করেছে সরকার। এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য হলো– রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা থাকায় সরকারকে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নিতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক আইন আছে। গণবিক্ষোভ কিভাবে দমন করা যায়, তার নীতিমালাও আছে। পুলিশের জন্য জাতিসংঘের কোড অব কনডাক্ট রয়েছে। কাউকে গ্রেফতার করা হলেও একটা সময়ের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে অথবা তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে হবে। কিভাবে তাকে গ্রেফতার করা হলো, সেটা জানাতে হবে। কাউকে মারধর করার অধিকার পুলিশের নেই। অনেক সময় পুলিশকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু সেটা যথাযথভাবে হয় কিনা, তাতে মাত্রা বজায় থাকে কিনা– এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, বাংলাদেশে এ বিষয়গুলো মানা হয় না। বাংলাদেশের সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠুক– এটা যেন সরকারগুলো চায় না। র‍্যাবের ব্যাপারেই বলুন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর নির্যাতনের প্রসঙ্গই হোক বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয় হোক, সব ক্ষেত্রেই যেটা প্রয়োজন, তা হলো একটা কার্যকর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বহু বছর ধরেই এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর না থাকায় পরিস্থিতির দিনে দিনে অবনতি ঘটছে। বর্তমান সরকার বা এর আগের সরকার কেউই এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার ব্যাপারে আন্তরিকতার প্রমাণ রাখতে পারেনি। অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলোই দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশের সরকারগুলো জনসমর্থনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি ও তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যাপারেই যেন বেশি আগ্রহী। র‍্যাব গঠন এর সর্বশেষ প্রমাণ। *(সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ)*

আইরিন খান: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব